সংবাদ

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আগামীর শিক্ষক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

এমএম রহমান

একবার ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে (১৯৮৯-১৯৬৪) প্রশ্ন করা হয়েছিল, এখন থেকে বিশ বছর পরের ভারতকে আপনি কেমন দেখতে চান? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সেই উত্তর জানতে হলে এখন থেকে বিশ বছর পরে যারা ভারত পরিচালনা করবে, তাদের কাছে যেতে হবে। তারা এখন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাদেরকে এখন যেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ বছরের ভারত সেভাবে চলবে। যদি তাদেরকে এখন সুশিক্ষা দিয়ে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে বিশ বছর পরের ভারতও সুন্দরভাবে চলবে।

ভবিষ্যতে যারা দেশ চালাবেন তাদের জন্য যদি এখনই সুশিক্ষা নিশ্চিত করা না যায় তাহলে দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন দূরে থাক, দেশ অনেক পিছিয়ে পড়বে। সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রধান নিয়ামক হল সুশিক্ষক। সুশিক্ষক বা আদর্শ শিক্ষক নিশ্চিত না করে সুশিক্ষার অন্য সব উপাদান নিশ্চিত করলেও সুশিক্ষা কখনো সুসম্পন্ন হবে না। দেশের যে কোন খাতের কর্মবীরদের প্রাথমিক ভিত্তিটা রচিত হয় শিক্ষকের হাতেই। এই কারণে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কী রকম শিক্ষক নিশ্চিত করতে পারছি, তার ওপর।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, এখন আর আগের মতো মেধাবী, যোগ্য ও দায়িত্বশীল শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে, এখনকার স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক মেধা, দায়িত্ববোধ, সততা ও পেশাগত নিষ্ঠার বিচারে মোটেই শিক্ষকসুলভ নন। শিক্ষাখাতের বর্তমান এই চিত্র যদি হতাশাজনক হয়, তাহলে এই খাতের ভবিষ্যৎ চিত্র হবে রীতিমতো ভয়াবহ বা আতঙ্কজনক। শিক্ষাখাতের বর্তমান চিত্রের জন্য দায়ী পেছনের কারণগুলো যদি ভবিষ্যতেও অপরিবর্তিত থাকে তাহলে, মুটে-মজুর শ্রেণির প্রতি শতভাগ শ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই, মুটে-মজুররা হবেন আগামীদিনের শিক্ষক। মুটে-মজুরের যোগ্যতা নিয়ে শিক্ষকরা পড়াবেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর সেই প্রজন্মই চালাবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। নানাবিধ কারণে শিক্ষকতা আজ এতটাই অনাকর্ষণীয় আর গুরুত্বহীন পেশায় পরিণত হয়েছে যে, ন্যূনতম মেধা আর যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরাও আজ আর শিক্ষক হতে চায় না। ফলে শিক্ষকতা আজ সমাজের পরিত্যক্ত ও প্রান্তিক পেশায় পরিণত হয়েছে। যারা আজ এ পেশায় আসছেন, তাদের অধিকাংশই অনন্যোপায় হয়ে এ পেশায় আসছেন। একান্ত অনন্যোপায় ও অনিচ্ছুক এইসব পেশাজীবী (শিক্ষক) দিয়ে কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের আদর্শ শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয় (অধিকাংশ শিক্ষক আজ অনিচ্ছুক পেশাজীবী এই অর্থে যে, তারা ইচ্ছা করে পেশার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে শিক্ষকতায় আসেননি; এসেছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত পেশায় প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে)। এই অযোগ্য আর অনিচ্ছুক শিক্ষক দিয়ে মোটেই জাতির সুযোগ্য ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি তৈরি করা সম্ভব নয়। এই সত্য উপলব্ধি করে দেশের অনেক রাজনীতিক, উচ্চপদস্থ আমলা, নিম্নপদস্থ অসৎ চাকরিজীবী আর ধনী ব্যবসায়ীরা তাদের ছেলেমেয়েদের ইতোমধ্যে দেশের বাইরে পাঠাতে শুরু করেছেন তথাকথিত কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত শিক্ষা লাভের আশায়। অনেকে আবার তাদের ছেলেমেয়েকে বিদেশি কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যয়বহুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সেই সামর্থ্য তো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নেই। আর সামর্থ্য থাকলেও আদর্শিক বিবেচনায় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থ সুরক্ষায় এটা সঠিক পন্থা বা উপযুক্ত সমাধান হতে পারে না।

আমাদের স্কুল-কলেজে আমরা এখন কাদেরকে, কিভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি তা জানতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব কেন শিক্ষা খাতের ভবিষ্যৎ চিত্রকে রীতিমতো ভয়াবহ বা আতঙ্কজনক বলা হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষার আবেদনকারীদের চাকরির পছন্দক্রম তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশ প্রার্থীর (যাদের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা প্রযোজ্য) পছন্দ তালিকার তলানিতে থাকে শিক্ষকতা। প্রথম পছন্দ শিক্ষকতা- এমন ঘটনা খুবই বিরল। এরপরও শিক্ষা কাডারে চাকরি হলে তাদের একটি বড় অংশ ৩০ বছর বয়সের শেষদিন পর্যন্ত অন্য কাডারে চাকরির চেষ্টা করেন। অনেক মেধাবী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী সরকারি অফিসের কেরানি, পুলিশের এসআই বা সরকারি অফিসের নিম্ন শ্রেণীর/গ্রেডের চাকরি করতে প্রস্তুত কিন্তু শিক্ষক হতে আগ্রহী নন। দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ও কলেজগুলোতে যারা চাকরি করেন তারাও ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত চেষ্টা করেন অন্য চাকরি খোঁজার। জীবনের শেষ চেষ্টাটাও যখন ব্যর্থ হয় তখন তারা অত্যন্ত ভগ্ন মন নিয়ে শিক্ষকতায় থেকে যান। শিক্ষকরা ন্যূনতম বেতন ভাতা ছাড়া অন্য কোন সুবিধা যেমন পান না, তেমনি পান না সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্মান। ফলে যার যোগ্যতা আর উন্নত সুযোগ-সুবিধার মোহ থাকে সে আর শিক্ষকতায় থাকে না। সব থেকে অযোগ্য প্রার্থী সবথেকে বেশি ডোনেশন (প্রকারান্তরে উৎকোচ) অফার বলে অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল-কলেজে সবথেকে অযোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে এসেছেন। তাহলে কাদেরকে আমরা আজ শিক্ষক হিসেবে পাচ্ছি তা সহজেই অনুমেয়। এই যদি হয় আমার শিক্ষকের অবস্থা, তাহলে তার শিক্ষাদানের মান আর আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভ কতটা মানসম্মত হয় তা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবনাটা মূল্যায়ন করলেও আমরা শিক্ষা খাতের এই কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারব। যেমন : আমরা আমাদের সন্তানকে মোধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের নিকট পড়াতে চাই। কিন্তু আমাদের অসাধারণ মেধাবী সন্তানটা শিক্ষক হোক, তা কিন্তু আমরা চাই না। কারণ আমরা জানি, যথাযথ সুযোগ-সুবিধা সে পাবে না, পাবে না একটা সম্মানিত উন্নত জীবন। তাহলে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক কোথা থেকে আসবে?

দেশের সর্বাধিকসংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে। বিগত কয়েক দশক ধরে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে ডোনেশনের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এসব স্কুল-কলেজের ভীতকেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা থাকে স্থানীয় 'গভর্নিংবডি' নামক কর্তৃপক্ষের হাতে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্যরা সব সময় প্রাধান্য পেয়েছেন। কারণ, যার যোগ্যতা যত কম সে নিলামে তত বেশি তথা-কথিত ডোনেশন হাকে। যোগ্য প্রার্থীরা অর্থের বিনিময়ে এই নিলামে অংশ নেয় না; আর নিলেও নিলামে বড় দর হাকে না। কারণ, তার অন্যত্র অন্য চাকরি পাওয়ার আর আশা থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অজুহাতে এই অর্থ গ্রহণ করে থাকলেও অধিকাংশ সময় সমুদয় অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। এইসব নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনাও খুব অদ্ভুত। স্থানীয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে রাজনৈতিকভাবে সরকারি দল সমর্থক পরিবারের প্রার্থীরা অপছন্দের পাত্র। কারণ, তারা মন্ত্রী-এমপি'র সুপারিশ এনে ডোনেশনের টাকা কমিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক প্রভাব না থাকার কারণে বিরোধী দল সমর্থক পরিবারের প্রার্থীরা মোটা অঙ্কের টাকা হাকেন বলে তারা স্থানীয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। 'খারাপ মুদ্রা যেমন বাজার থেকে ভালো মুদ্রাকে বিতাড়িত করে', তেমনি এই অযোগ্যরা অসাধু প্রতিযোগিতায় যোগ্যদেরকে প্রতিযোগিতা থেকে বিতাড়িত করে থাকে।

অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক বানানোর নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং জাতির জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি একটি স্কুল বা কলেজে 'এ' গ্রেডের শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায়, তাহলে সেখানে সেই শিক্ষক ২৫-৩০ বছর ধরে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে 'এ' গ্রেডের শিক্ষাসেবা দিয়ে গড়ে তুলবেন। এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আবার তাদের কর্মজীবনে লাখ লাখ মানুষকে অপেক্ষাকৃত উন্নত গ্রেডের সেবা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফলে দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, তথাকথিত ডোনেশনের বিনিময়ে 'সি' বা 'ডি' গ্রেডের শিক্ষক নিয়োগ দিলে সেই শিক্ষক ২৫-৩০ বছর ধরে ঐ প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে 'সি' বা 'ডি' গ্রেডের শিক্ষাসেবা দিয়ে গড়ে তুলবেন। 'সি' বা 'ডি' গ্রেডের মানে শিক্ষিত এইসব হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আবার লাখ লাখ মানুষকে 'সি' বা 'ডি' গ্রেডের সেবা দিয়ে দেশের অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেবে। এসব 'সি' বা 'ডি' গ্রেডের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতাও শিখবে না। কারণ, তারা নিজেরাই আগে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে উৎকোচের বিনিময়ে চাকরি নেয়। নৈতিকতা-বর্জিত শিক্ষকের হাতে নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক গড়ে উঠতে পারে না। এই কারণে একজন অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিলে হাজার হাজার অযোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার পথ তৈরি হয়। তাই একজন অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পাপ হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করার পাপের সমান। দেশের এই অপূরণীয় অসামান্য ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য সরকার সম্প্রতি 'বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক একটি সিদ্ধান্ত। কিন্তু যে ক্ষতি ইতোমধ্যে ঘটে গেছে জাতিকে তার খেসারত দিতে হবে বহু বছর ধরে। এর সমাধান কী?

একজন শিক্ষার্থীর মনোজাগতিক চিন্তাধারা, চেতনা, প্রবৃত্তি ও মানস গড়ে ওঠে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালে। ফলে এই স্তরে শিশুদের আদর্শ শিক্ষক দ্বারা সুশিক্ষাদান করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ্য মেধাবীদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য একজন পুরুষ প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা (স্নাতক) আর বিসিএস সাধারণ কাডারের কোন পদে (যেমন : বিসিএস প্রশাসন) আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতা একই। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বেতন ২০১৫ সালের ৮ম জাতীয় বেতন স্কেলের ১৬ নম্বর গ্রেডে ৯৩০০ টাকা। একজন সুইপার বা প্রহরীর বেতন ২০ নম্বর গ্রেডে ৮২৫০ টাকা। অর্থাৎ, স্নাতক ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষকের বেতন একজন সুইপার বা প্রহরীর বেতনের থেকে মাত্র ১০৫০ টাকা বেশি। সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধান চালু থাকাতে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে মাত্র ৪-৫ শতাংশ শিক্ষক প্রধান পদে পদোন্নতির সুযোগ পেয়ে থাকেন। ৮ম পে স্কেলে টাইমস্কেল বাতিল করায় ঐ শিক্ষক চাকরির ১১তম বর্ষে ১৫ নম্বর গ্রেডে (৯৭০০ টাকা) এবং ১৭তম বর্ষে ১৪ নম্বর গ্রেডে (১০২০০ টাকা) উন্নীত হয়ে চাকরি করে যাবেন। তিনি সারজীবনে আর ১৪ নম্বর গ্রেড অতিক্রম করতে পারবেন না। বিনা সম্মানী বা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নানারকম জরিপসহ অন্যান্য কাজ করিয়ে নেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন কেরানির পদ না থাকাতে সেখানে উপবৃত্তিসহ নানা রকম অফিসিয়াল কাজ ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে শিক্ষকদেরই করতে হয়। এসব কারণে এই পেশায় মেধাবী, যোগ্য ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক হিসেবে আসতে চায় না।

rahmanmm40@gmail.com